যুগান্তর

তারিখ 14 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বদরুদ্দীন উমর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা

আশির দশকে এরশাদের সামরিক শাসনের অবসানের পর ১৯৯১ সালে 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থা চালু হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল ইউনিয়নগুলোর কোনো নির্বাচন হয়নি। অর্থাৎ বিগত ২৫ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পূর্বপ্রচলিত সাংগঠনিক রীতিনীতির কোনো অনুশীলন আর নেই। একের পর এক ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল নিজেদের দলীয় রাজনীতির স্বার্থে ছাত্রদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নগুলোর নির্বাচন এভাবে স্থগিত রেখেছে বা কার্যত উচ্ছেদ করে দিয়েছে। এর পরিণতি যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির শর্ত তৈরি হয়েছে এবং বাস্তবত অরাজক পরিস্থিতি তখন থেকেই বিরাজ করছে। এর পরিবর্তন একাধিকবার সরকার পরিবর্তন সত্ত্বেও হয়নি।

এখন ছাত্রদের দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হল 'দখল' করার কথা শোনা যায়। আগেও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় ও হল দখল করত। কিন্তু তার পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সংসদ ও হলগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো, যা বিশ্ববিদ্যালয় ও হল কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত হতো। সেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও 'হল দখলের' একটা নিয়ম-কানুন ছিল এবং তার ফলে কোনো বিশৃংখল পরিস্থিতি সৃষ্টির কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয় ও হল দখল হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে। যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর দখল রাখে এবং কর্তৃপক্ষের ছত্রছায়ায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের গুণ্ডাপাণ্ডা ছাত্ররাই অন্য ছাত্রদের ওপর ছড়ি ঘোরায়। পরে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ভৌতিকভাবে পরিবর্তিত হয়। পরাজিত রাজনৈতিক দলের যে ছাত্র নেতারা গুণ্ডামির মাধ্যমে একচ্ছত্রভাবে নিজেদের ক্ষমতা চর্চা করত, তাদের পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক দল পরাজিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তারা রাতারাতি ভৌতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল ছেড়ে পলায়ন করে এবং কিছুদিন পলাতক থাকে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের ছাত্ররা তাদের পূর্ববর্তীদের অনুকরণে অর্থাৎ একই কায়দায় গুণ্ডামির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোর ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ক্রায়েম করে শুরু করে দুর্বৃত্তগিরি। এটা সম্ভব হয় আরও এই কারণে যে, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও পরিবর্তন হয়। যে পূর্ববর্তী উপাচার্য পূর্ববর্তী সরকারের অনুগত লোক হিসেবে ছাত্রদের অপকর্মে সহায়তা করতেন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতেন, তাদের সরিয়ে দিয়ে নতুন সরকার নিজেদের অনুগত উপাচার্য নিয়োগ করে।

এখানে বলা দরকার, ছাত্র নেতাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখাই তাদের দুর্বৃত্তগিরির একমাত্র দিক নয়। এর একটা নিকৃষ্ট রূপ হল, ছাত্র অবস্থাতেই নতুন প্রজন্মের এসব ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের আর্থিক সুযোগ-সুবিধাও দেয়। অর্থাৎ তাদের জন্য দুর্নীতির ব্যবস্থা করে এবং তাদের পরিণত করে দুর্নীতিবাজে। অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতারা যে দুর্নীতি করে থাকেন তার 'প্রশিক্ষণই' এই ছাত্ররা সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছত্রছায়ায় লাভ করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা নির্মাণ কাজ এবং অন্য কাজের টেন্ডার নিয়ে দুর্নীতি করে। তাদের এই টেন্ডারবাজি ও তার সঙ্গে নানা ধরনের চাঁদাবাজি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি ছাত্র নেতাদের আয়ের একটা বড় উৎস। কিন্তু শুধু তাই নয়। ক্ষমতাসীন

রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নেতাদের নিয়মিতভাবে মোটা টাকা দেয় যা ভাগাভাগি হয় তাদের মধ্যে। বলাই বাহুল্য, এসব গুণ্ডাপাণ্ডা, দুর্নীতিবাজ ও দস্যু প্রকৃতির ছাত্রদের সঙ্গে লেখাপড়ার বিশেষ সম্পর্ক থাকে না। এই ছাত্ররা অনেকে নিজেদের ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ে সিট দখল করে নিজেদের রাজত্ব চালায়।

এ পরিস্থিতি বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দুই সরকারের আমলেই দেখা যায়। তবে সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগ বেশি শক্তিশালী হওয়ায় তাদের আমলে ছাত্রদের এ দুর্বৃত্তগিরি আরও অনেক নিষ্ঠুর ও সংগঠিতভাবে হয়ে থাকে। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু। এ ছাত্রটি ২০১৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিং বিভাগে ভর্তি হয়। সরকারি ছাত্র সংগঠন নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিভিন্ন হলে ছাত্রদের সিট নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করে। হলে সিট পাওয়া নির্ভর করে সরকারি ছাত্র নেতাদের অনুমোদনের ওপর। সরকারি দল না করলে সাধারণত নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রদের সিট পাওয়া সম্ভব হয় না। ভর্তি ছাত্রদের সংখ্যার তুলনায় সিট সংখ্যা কম থাকায় অনেক ছাত্রকে বিভিন্ন হলের বারান্দায় থাকতে হয়। সেখানে তারা শোয় ও পড়াশোনা করে! এই বারান্দার সিট পাওয়াও নির্ভর করে ছাত্র নেতাদের মর্জির ওপর। এভাবেই মার্কেটিং বিভাগের উপরোক্ত ছাত্র হাফিজুর মোল্লা সলিমুল্লাহ হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের 'কর্মী' হিসেবে জায়গা পায় হলের দক্ষিণ দিকের বারান্দায়। সেখানে শীতের দিনে ঠাণ্ডা লেগে সে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়। কিন্তু সেই অবস্থায় প্রবল জ্বর নিয়েও তাকে ছাত্রলীগের 'ডিউটি' করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ডিউটি হল অনেক রাত পর্যন্ত খোলা জায়গায় ছাত্রলীগের 'গেস্টরুম' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ। 'গেস্টরুম' হচ্ছে ছাত্রলীগের একটা দলীয় রীতি। এ সময় ছাত্রলীগের জ্যেষ্ঠ নেতারা কনিষ্ঠ ও নবাগত কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে এবং ছাত্রলীগ কীভাবে করতে হবে ও হলে কীভাবে থাকতে হবে এসব নিয়ে তাদের তালিম দেয়া হয়! এ ধরনের এক 'গেস্টরুম' প্রোগ্রামে অসুস্থ হাফিজুর মোল্লাকে শীতের রাতে খোলা স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয় নেতাদের থেকে সবক নেয়ার জন্য। প্রবল জ্বরের কথা বলা সত্ত্বেও তাকে বাধ্য করা হয় এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য। এর ফলে তার স্বাস্থ্যের ভয়ংকর অবনতি হয় এবং সে গ্রামের বাড়িতে চলে যায়। সেখানে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার বাবা ফরিদপুরের এক গ্রাম থেকে তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে আসার পথে দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে তার মৃত্যু হয়।

ছাত্রলীগ নেতাদের অপরাধমূলক কাজের কারণেই যে এ ছাত্রটির মৃত্যু হয় এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ মৃত্যুর দায়ভার নিতে কেউই রাজি নয়। ছাত্রটির মুরব্বি হল শাখার সম্পাদক বলে যে, তারা সপ্তাহে দুই দিন 'গেস্টরুম' করে। কিন্তু প্রথম বর্ষের কোনো ছাত্রকে তাতে রাখা হয় না! এটা যে এক ডাহা মিথ্যা এটা বোঝার অসুবিধা নেই। 'গেস্টরুমে' কনিষ্ঠ ছাত্রদের যে তালিমের ব্যবস্থা করা হয়, সেটা প্রথম বর্ষের ছাত্রদের জন্যই সব থেকে প্রয়োজনীয়। তার ভাষ্য অনুযায়ী, প্রথম বর্ষের ছাত্রদের গেস্টরুম করতে হয় না। তারা শুধু জ্যেষ্ঠ নেতাদের সালাম দিয়ে চলে যায়! (প্রথম আলো, ০৬.০২.২০১৬)। এই 'সালাম' দেয়ার ব্যাপার থেকেই বোঝা যায় জ্যেষ্ঠ ছাত্রলীগ নেতারা নবাগত ছাত্রদের কীভাবে চাকর-বাকরের মতো ব্যবহার করে। আগেকার দিনে এসব ছিল কল্পনারও বাইরে।

এক্ষেত্রে সব থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার হল, ছাত্রলীগের সলিমুল্লাহ হল শাখার সম্পাদক বলে, সপ্তাহে দুই দিন রাতে তারা 'গেস্টরুম' করে। কিন্তু হলের প্রাধ্যক্ষ গোলাম মহম্মদ ভূঁইয়া বলেন, ছাত্রলীগের 'গেস্টরুমের' বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না! তার এ কথার অর্থ এক হতে পারে যে, তিনি জেনেশুনে মিথ্যা বলছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি এতই অকর্মণ্য যে হলের কোনো কিছুর খবরই তিনি রাখেন না। বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ সরকার ও জনগণের অর্থে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের কর্তব্য কাজ তিনি করেন না এবং সরকারের লোক হওয়ার কারণে সেটা করার পরোয়া পর্যন্ত তার নেই। এসব লোকের আচরণ বিষয়ে তদন্ত হওয়া দরকার এবং দায়িত্ব পালন না করার জন্য শাস্তি হওয়া দরকার। কিন্তু এর কোনো সম্ভাবনাই নেই। কারণ তিনি সরকারের লোক। উপাচার্যের আজ্ঞাবাহী। উপাচার্যও বলেন, ছাত্রটির অবস্থা সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না এবং এ বিষয়ে তিনি তদন্ত করবেন! কিন্তু সবাই জানেন, সরকারের পরম অনুগত লোক হিসেবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের পৃষ্ঠপোষক এবং এমন কোনো তদন্তই তিনি করবেন না যাতে ছাত্রলীগ নেতাদের এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষের কোনো শাস্তি হতে পারে। সরকারের হুকুম তামিল করাই তার কাজ। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা যাই হোক, তিনি সরকারি ছাত্র সংগঠনের স্বার্থই রক্ষা করবেন এবং তাদের কোনো শাস্তি যাতে না হয় সেটা দেখাই নিজের 'কর্তব্য' বিবেচনা করেন। এ অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অরাজক পরিস্থিতি তার উপাচার্য থাকাকালে পরিবর্তনের যে কোনো সম্ভাবনা নেই এটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, এ অবস্থা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়। বাংলাদেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা এদিক দিয়ে অভিন্ন। অরাজক অবস্থার মধ্যেই এগুলোতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিদ্যাচর্চা চলছে!

১৩.০২.২০১৬

বদরুদ্দীন উমর : *সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল*